সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নয়া দিশার খোঁজে

কল্যাণ সান্যাল

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অনুলিখন—ঋিজিৎ রায়

স্রেফ তেলের জন্য ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ আগ্রাসন, এটা আমি মনে করি না। এটা তেলের জন্য যুদ্ধ নয়। আমেরিকার তেল মূলত আসে ভেনেজুয়েলা থেকে। পশ্চিম এশিয়ার তেল যায় ইউরোপ আর জাপানে। বিশ্বের তেল-ভান্ডারের ১১ শতাংশ আছে ইরাকে যার মাত্র তিন শতাংশ ইরাক বিক্রি করতে পারত রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ফুড ফর অয়েল' প্রকল্পের কল্যাণে। অর্থনৈতিক অবরোধের জেরে তেলের রাজনীতিতে আমেরিকান স্বার্থ-বিরোধী এমন কোনও কাজ করেননি সাদ্দাম হোসেন যা জুনিয়র বুশকে তাঁর বাবার মতোই ইরাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে থাকবে। বাবা বুশ '৯১ সালে ইরাকে হানা দেন সাদ্দাম কুয়েত দখল করে পশ্চিম এশিয়ার শক্তি-ভারসাম্য টলিয়ে দিয়েছিলেন বলে। এবার তো সেই অজুহাতও ছিল না। মারণাস্ত্র ধ্বংস করার মত ফালতু একটা অজুহাতে ইরাককে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার পেছনে আসল কারণ তেল নয়। আমেরিকা তো জানে এই যুদ্ধের জেরে আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ কী তীব্র আকার ধারণ করবে। শুধু তেলের জন্য বুশ এতবড় ঝুঁকি নেননি।

আমার মনে হয় নাইন ইলেভেন বা নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের যমজ টাওয়ারে বিমান হানার প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধটাকে দেখতে হবে। টুইন টাওয়ার তো আমেরিকান জাতি-রাষ্ট্রের বৈভব, ক্ষমতা, বিশ্ব-প্রভুত্বের প্রতীক শুধু নয়, ওটা ছিল বিশ্ব-পুঁজির উদ্ধত বিজয়কেতন। উত্থিত পুষাঙ্গও বটে। মহম্মদ আটারা সেই পুষাঙ্গ কেটে নিয়ে মার্কিন এবং বিশ্ব-পুঁজির পাহারাদারদের নপুংসক বানিয়ে দেয়। আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েও লাদেনের খোঁজ মেলে নি। লাদেন তো একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান নয়, সে রাষ্ট্রহীন। সাদ্দাম সেখানে একটা দেশের প্রধান। তার একটা সেনাবাহিনী, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও অন্যান্য দেখনদারি ছিল। ইরাক পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশও বটে। ইরাককে গুঁড়িয়ে, সাদ্দামকে হটিয়ে বুশ-ব্লেয়ার বিশ্ব-পুঁজিবাদের যে 'ডিসিপ্লিনারি রেজিম' বা শৃঙ্খলার ঘেরাটোপ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। নাইন ইলেভেন কাণ্ডের পর ওটায় ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সাদ্দাম এখানে ওসামার 'সারোগেট' বা বদলি মাত্র। আমেরিকান আধিপত্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ইরাক-যুদ্ধ অনেকটাই 'রিচুয়ালিষ্টিক ওয়ার'। ওরা একটা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নামে স্পেকটর বা ভুতুড়ে ছায়ার সঙ্গে লড়ছে। আর ছায়ার সঙ্গে বেশিক্ষণ লড়া যায় না, তাই ইরাকের মধ্যে একটা কায়া খুঁজে ওরা তাকে শায়েস্তা করে পুঁজির অহং চরিতার্থ করল।

রাষ্ট্রপুঞ্জের তোয়াক্কা না রেখে যুদ্ধটা যে চাপিয়ে দেওয়া হল তাতে বোঝা যাচ্ছে ওরা বিশ্বায়নের নামে নয়া বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কায়েম করলেও এখনও তার মানানসই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটা তৈরি করে উঠতে পারেনি। ওরা নতুন রাজনৈতিক কাঠামোটা খুজঁছে। রাষ্ট্রপুঞ্জকে ভেঙেচুরে নতুন করে বানানোর কথা বলছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে উঠেছিল জাতি-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব, সমতা ইত্যাদি ধারণার উপর ভিত্তি করে। উপনিবেশ-উত্তর পৃথিবীতেও মোটামুটি সাম্রাজ্যবাদী যুগের ছকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলি বিন্যস্ত ছিল। পূর্ব বনাম পশ্চিম, উত্তর বনাম দক্ষিণ, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকান ব্লক বনাম সোভিয়েত ব্লক এসবের মধ্যেও জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা মুছে যায়নি। কিন্তু ঠান্ডা-যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীতে বিশ্বায়নের নামে পুঁজি, শ্রম ও বাজারের যে নতুন জমানা তৈরি হয়েছে আই এম এফ, ডব্লু টি ও-র উপর ভিত্তি করে, তাতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণাটি অচল হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান কাঠামোটি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হিটলার মুসোলিনীরাও জাতিরাষ্ট্রের ধারণা, জার্মানি বা ইতালির জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এসব দাবির ভিত্তিতে আগ্রাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছিল। বুশ-ব্লেয়ার সেখানে আক্রমণ চালাচ্ছে অন্ধকার বনাম আলো, গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র, শুভ বনাম অশুভ এসবের ধুয়ো তুলে। এর পিছনে খ্রিস্টান অনুষঙ্গ, এনলাইটনমেন্ট-এর বুলি কাজ করছে। তবে তার থেকেও বেশি কাজ করছে দুনিয়াকে নিজেদের মতো একটি শৃঙ্খলা এবং নজরদারির বিশ্ব-ব্যবস্থায় বেধে ফেলার উদগ্র বাসনা। যেখানে কোনও বিরোধিতা সহ্য করা হবে না। যেটুকু সুযোগ আছে তা ভিতর থেকে করতে হবে যেমন ফ্রান্স বা জার্মানি করছে। বাইরে থেকে বিরোধিতা বা সমান্তরাল কোনও ব্যবস্থা (যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন) চেয়েছিল মানা হবে না। ফুকোর বক্তব্য এই শৃঙ্খলা ও শাস্তি ব্যবস্থা বা 'প্যান অপটিকন' মধ্যে দুনিয়াকে পুরে ফেলার তাগিদটা সবসময় যে মুনাফার তাৎক্ষনিক প্রয়োজন থেকে হবে এমন নয়। ইরাকের ক্ষেত্রেও হয়নি। 'স্পেকটর অব কমিউনিজম'-এর পর 'স্পেকটর অব ইসলাম' ওরা দেখতে চায় না। সভ্যতার সঙঘাতের তত্ত্বটা ওসামার জিহাদের বিদ্ধে পাল্টা জিহাদকে মার্কিন জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কাজে লেগেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্যি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের জমিটা ইসলামিক শক্তিগুলি অনেকটাই নিয়ে নিয়েছে। এদের শেকড় অনেকদূর। জয় করেও তাই আমেরিকানদের ভয় যায় না।

এই পরিস্থিতিতে আমাদেরও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পুরোন ছক থেকে বেরোতে হবে। বুঝতে হবে বিশ্ব-পুঁজিবাদের মন্দাজনিত কারণে ইরাক যুদ্ধ হচ্ছে না। বাজার বা কাঁচা মাল দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে লড়াইয়ের পুরোন ছবিটার সঙ্গে এটাকে মেলানো যাবে না। নতুন বিশ্বব্যবস্থাতেও পুরোন কাঠামোর ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়ার যুদ্ধ বিরোধিতার গুত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা সোভিয়েত-মার্কিন ব্লকের মতাদর্শগত লড়াইয়ের মতো মৌলিক কিছু নয়। নতুন ব্যবস্থায় প্রভুত্বের স্তর বিন্যাসে জায়গা পাওয়া গিয়ে টানাপোড়েন চলছে মাত্র। সুতরাং মার্কিন-ব্রিটিশ জোটের বিদ্ধে অন্য কোনও জোট তৈরি হলেও তা মোটেই কোনও মৌলিক বিরোধিতায় যাবে না। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের শাসকদের ক্ষেত্রেও একই খাটে। মার্কসবাদীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগানকেতৃতীয় বিশ্বের শাসকরা এতদিন আত্মসাৎ করে এসেছেন। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ দ্বন্দ্ব ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম পূর্বের মধ্যেও পশ্চিম আছে। দক্ষিণের মধ্যে উত্তর আছে। ভারতের কর্পোরেট পুঁজি বিশ্ব-পুঁজি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এদের জাতীয়তাবাদী বিকাশের স্বপ্ন দেখে এবং দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিরোধ এবং স্বনির্ভরতার যে দাবি আমরা এতকাল এঁকেছি তা নেহাতই ভাবের ঘরে চুরি। যে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদকে শত্রুরূপে আমরা ভজনা করে এসেছি তার আবাহনে দেশের ছোট বা বড় পুঁজিবাদীদের সঙ্গে নিয়ে শিল্প উন্নয়নের মরা গাঙ্গে বান বইয়ে দেওয়ার গল্প থেকে সরে এসে আমরা 'এমবেডেড মিডিয়ার' মতো 'এমবেডেড ইকনমি'-র দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছি। এতটাই যে সি পি এম কে দিল্লিতে বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে কলকাতায় মার্কিন বহুজা

তিকদের হাত ধরে শিল্পায়নের স্বপ্ন ফিরি করতে হচ্ছে। যুদ্ধ-বিরোধিতার পাশাপাশি মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটে শিল্পায়ন মার খাবে কিনা, আমেরিকান বিনিয়োগ আটকে যাবে কি না তা নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে হচ্ছে। TINA factor বা 'দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ' এই তত্ত্বটা নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসছে। জাতীয় স্তরেও। মিটিং মিছিল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার পুরোন ছক মেনে। কিন্তু জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্ব-ব্যবস্থা ভেঙে যে নতুন দুনিয়াদারির ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মোকাবিলায় জাতি-রাষ্ট্রের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের সঙ্গে কীভাবে মিলব তা নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা দেখছি না। পণ্য-বয়কটের মতো প্রতীকী লড়াইয়ের গুত্ব আছে। ওটাকে লাগাতার চালিয়ে যেতে গেলে বহুজাতিক তথা বিশ্ব-পুঁজির বিরোধিতায় নামা প্রয়োজন।

আসলে পুরোন মার্কসবাদীরা 'ইকনমিক ডিটারমনিজম'কে মাথায় রেখে ভাবেন। সারা পৃথিবী জুড়ে, ইউরোপ-আমেরিকায় যে অভূতপূর্ব যুদ্ধ-বিরোধী মানবিক প্রতিবাদ তাকে ওরা গুত্ব দিচ্ছে না। এই উত্তরের মধ্যেও দক্ষিণ, দক্ষিণের মধ্যেও উত্তর-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ওরা বুঝছেন না। পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ শুধু নয়, লড়াইটা এখন বিশ্ব-পুঁজিরাসরোধকারী প্রভূত্বের বিদ্ধে 'লাইফ এগেনস্ট ক্যাপিট্যাল' হয়ে দাড়াচ্ছে। পুঁজিবাদ শুধু কারখানায় ঢুকিয়ে শোষণ করে না। কারখানার বাইরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রেখে দেওয়ার জন্যও এখন পুঁজির শক্তি নিয়োজিত। পশ্চিমি পুঁজিবাদী উন্নয়নের মডেলটার কল্যাণে লক্ষ লক্ষ কৃষক, আদিবাসী এখন ছিন্নমূল। বিশ্বায়ন বিরোধিতার পাশাপাশি আমরা এখন নগরোন্নয়নের নামে টালির নালা বা বেলেঘাটা খালের ধারে প্রান্তিক নগরবাসীদের উচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছি। বিশ্ব-পুঁজিবাদের বিজয় মিছিলে ভিড়ে গিয়ে আমরাও তার উন্নয়ন-যুদ্ধের 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'কে অধিকাংশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে সাফাই গাইছি। এই প্রান্তিক সমাজটাই আজ সর্বহারা সারা পৃথিবী জুড়ে। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধবজাধারীদের কাজকর্ম দেখা মনে হয় এইসব তথাকথিত উন্নয়ন এখন শ্রেনীসংগ্রামের বাইরে। ক্রমশ বিপুল হারে প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা কিন্তু বিলাপের কুলুঙ্গিতে তোলা শ্রমিক বিগ্রহের চালচিত্র থেকে ছিটকে পড়েছেন এই বিপুল জনগোষ্ঠী। বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য যারা রোজ লড়ছেন, তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামও যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিদ্ধে সংগ্রাম, এই বোধটাই নেই। অথচ লাইফের মধ্যেই তো লেবার আছে স্রেফ পুঁজি বনাম শ্রমের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ব্যাখ্যা করা যাবে না। যুদ্ধের ফলে মার্কিন শ্রমিকদের টি-জি মার খাচ্ছে বা অদূর ভবিষ্যতে খাবে এমন তো নয়। যুদ্ধ ইউরোপে নানা লোকের চাকরি খেয়ে নিয়েছে এমনও নয়। তবু তো মানুষ পথে নেমেছেন স্বত স্ফূর্ত ভাবে। কারণ স্রেফ এটা নয় যে যুদ্ধ আরও বেশি করে নাইন-ইলেভেন ডেকে আনবে। এই যে পশ্চিমের 'আদার' ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে, সারাক্ষণ একটা ভয়, ঘৃণা আর আতঙ্কের ঘেরাটোপে বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। লোকে বুঝতে পাচ্ছে, স্রেফ অস্ত্র-প্রযুক্তির জোরে দুনিয়ার বিপুলসংখ্যক মানুষকে পায়ের নিচে রেখে দেওয়ার চেষ্টা বেশিদিন চলতে পারে না। উল্টে পশ্চিম অবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া নিজেদের অভিজ্ঞতাতেও তারা বুঝতে পারছেন—পশ্চিমের মধ্যেই পূর্ব আছে। বিশ্বায়ন সেখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আধুনিকতা এবং প্রগতির নামে কি বিশাল ধ্যাস্টামো চলছে, তা তারাও অনুভব করছেন। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের সঙ্গে তাদের সহমর্মিতার পরিসরটি বাড়ছে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। এটাকে কেন্দ্র করেই দেরিদা নয়া আন্তর্জাতিকের ধারণার কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিকতার প্রথাগত ধারণায় ওটা ছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমন্বয়। পরে সেটা দাড়ানো কমিউনিস্ট দলগুলি বা সমাজবাদীদের সমন্বয়। কিন্তু নয়া আন্তর্জাতিক গড়ে উঠবে জাতি-রাষ্ট্রীয় এবং জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক পার্টিগুলির বাইরের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সংগঠন গুলির মধ্যে—এরকমটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন আমাদের।

এর মানে কিন্তু এটা নয়, শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রমিকশ্রেনীর আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মানে রইল না। এটাও নয় যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইতে কোনও কেন্দ্রীয় লক্ষ্যবস্তু থাকবে না। আসল কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পুঁজি যাদের বাজারের কেন্দ্রে রেখে শোষণ করছে এবং যাদের বাজারের বাইরে বের করে দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করছে, সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। জার্মানি, গ্রিস, স্পেন, ইতালিতে যুদ্ধবিরোধী শ্রমিক মিছিল ধর্মঘট হয়েছে এটা খুব আশার খবর। অন্যান্য দেশেও শ্রমিকরা পথে নেমেছেন। বহুমুখী, বহুত্ববাদী প্রতিবাদ প্রতিরোধ চলছে, তাকে মেলাতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের পুরোন ধারণাটি ছিল জাতিরাষ্ট্র কেন্দ্রিক। তার অনুসরণে স্রেফ মার্কিন-ব্রিটিশ বিরোধিতায় আটকে থাকলে চলবে না। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে পুরোন মার্কসীয় লেনিনীয় ধ্যানধারণার বদলে যারা সাম্রাজ্য বা 'এম্পায়ার'-এর তত্ত্ব হাজির করছেন, তারা জাতি-রাষ্ট্রের উর্ধে একটি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অবয়ব রূপ নিচ্ছে বলে মনে করছেন। এই সাম্রাজ্যের অনেকটাই নীরব, নিঃশব্দ অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক 'হেজেমনি' বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এই সাম্রাজ্যের বাইরে কিছু নেই। এমনকি তৃতীয় বিশ্ব নেই। বহুজাতিকের শু আমেরিকায় হলে তার শেয়ারহোল্ডাররা আজ তৃতীয় বিশ্বও ছাড়িয়ে। নানা কিসিমের সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলিও আন্তর্জাতিক ফিনান্স ক্যাপিটালের খাতক। দেশীয় কর্পোরেট সেকটর আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে পড়েছে। মার্কিন শাসনের হানাদার বাহিনীর সঙ্গেই এরা ছুটছে। এই 'এমবেডেড ইকনমি'তে পুরোন মার্কসবাদী মেটা-ন্যারেটিভ খাটবে না যে সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াদের বিকাশে জাতিরাষ্ট্রের পতাকা তুলে নেমে পড়ব। স্বদেশি, স্বনির্ভরতা, স্বয়ম্ভরতার কথা এখন মূলধারার পার্টিগুলিও বলে না। ট্রাডিশনাল বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দিশার ক্ষেত্রে এই অন্তর্নিহিত টানাপোড়েনটাকে problematise করার দায় পর্যন্ত স্বীকার করে না। ফলে তত্ত্বে বিশ্বায়নের বিরোধিতা করে আর বাস্তব রাজনীতিতে বিশ্বায়নের শক্তিগুলিকে আমন্ত্রণ জানায় সীমিত ক্ষমতা এবং অঙ্গ-রাজ্যে দরকার চালানোর বাধ্যতার অজুহাতে।

কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ-বিরোধী লড়াই বিশ্বায়ন-বিরোধী ব্যাপক জনতার মোর্চা গড়েই হতে পারো। সেখানে নতুন আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি গড়ে উঠছে। বিকল্প অর্থনীতির কথা বলা এখন সহজ নয়। সমাজতন্ত্রের সোভিয়েত-চাইনিজ বা কিউবান মডেল সামনে রেখে বিকল্পের কথা বলার দিন আজ আর নেই। পুরোন মেটা-ন্যারেটিভ আকঁড়ে ধরে ভেবে লাভ নেই। আবার সেটা নেই বলে র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির দিন শেষ বলে বাস্তববাদিতার দোহাই পাড়ারও মানে হয় না। বামপন্থীরা কার্যত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে না বিকল্প অর্থনীতি ও রাজনীতির একটি বিশাল চালচিত্রে নিজেদের সেঁটে দিতে পারলে নিজেদের অনেক বিরাট মাপের ছবি তৈরি করা সম্ভব হয় বটে। কিন্তু তার ফাঁকিটা ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে আমজনতার কাছে। বরং আজকের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পথে নেমেই পথ সন্ধান করা। বিকল্পের নানা ধারণা আন্দোলনের নানা স্তরে রয়েছে। তাকে সংহত করতে হবে, যৌথভাবে মেলাতে হবে, ঝাড়াইবাছাই করতে করতে এগোতে হবে। আজ মার্কসবাদী ও উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ববাদীদের অনেকেই 'বাস্তবতা' মেনে চলার পক্ষে। আবার দুই শিবিরেই বহু মানুষ মুক্তিকামী রাজনীতির পক্ষে। এদের কাছাকাছি আসাটাও আজ জরি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com